পরিবেশ হইতে সাবধান

মোহিত রায়

মন চল নিজ নিকেতনে। তবে কেমন সে নিকেতন? মন বাউল কি বলে হে বলে হে? কেমন সে নিকেতন তা বলা হয়েছে ইন্ডিয়া টুডে-র ২সেপ্টেম্বর, ২০০২-সংখ্যায়। দিল্লী শহর থেকে ২৫ কিলোমেটার দূরে সেই শান্তিনিকেতন ও পরিবেশ-গ্রাম। এখানে ঘরবাড়ি কাফে রেস্তোঁরা গল্ফকোর্স লেক, ক্লাব - সবই আছে, সবই আছে সবুজ পলিবেশে। এখানে আছে ২৫০০০ গাছ, অখানে সব বর্জ্য পুনশ্চক্রায়িত হবে। প্লাস্টিক থাসবে না। বর্জ্য থেকে হবে জৈবগ্যাস। কম্পোস্ট সার। গাড়িতে বাজবে না হর্ন। এর পরিকল্পনা করছে এক ব্রিটিশে কোম্বানি। এই নিকেলের মালিক পরিবেশপ্রেমী অগ্নিনী খুরানা তার ১০০০ কোটি টাকার লটারি ব্যবসা থেকে এই নতুন কর্মকান্ডে নেমেছেন। এই শান্তিনিকেতনের এক একটা বাড়ির দাম পড়বে ন্যূনতম ১ কোটি টাকা। পরিবেশপ্রেমের জন্য এই দাম দিতে রাজী অনেকেই - জানেন অগ্নিনী খুরানা।

পরিবেশ প্রেমের এই ঢেই এখন বইছে আঝি। একেবারে শক্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায় রে। একেবারে নতুন মডেলের গাড়ি, যার ৩০ শতাংশ তৈরি প্লাস্টিকে - সেই গাড়ির সুবেশা মাগিক এসে যোগ দিচ্ছে প্লাস্টিক বিরোধী মিছিলে, যার বাড়িতে এখনো বিদ্যুৎ পৌছয়নি সেও হ্যাবিকেনের আলোতে রচনা লিখছে বিকল্প শক্তি নিয়ে। ঝিসুন্দরী থেকে গ্রামের এক এন জি ও কর্মচারী - এক নতুন বমনবশৃঙ্খল। এক নতুন শেকলে বাঁধা হচ্ছে সব মানুষকেই। এই পরিবেশ শৃঙ্খল নিয়ে কিছু কথা।

অবাক জলপান

বছর খারেনক হবে, গত পুজোর কিছুদিন আগে, হুগলীর শল্পাঞ্চলেক কছু মানুষ ঠিক করলেন যে এবার পুজোর সময় পরিবেশ নিয়ে প্রচারাভিযান চালাবেন। এই মানুষজনেরা মোটামুটি রাজনৈতিক ভাষায় সচেতন মানুষ, বামপন্থীতো বটেই এবং সরকারী বামপন্থীও নন। স্তিন পেশার, মূলন ত্রিশোর্ধ, চল্লিশ পঞ্চাশের বয়সের কিছু রাজনৈতিক-আধা রাজনৈতিক-আধা রাজনৈতিক মানুষ। স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কিছু কববেন বলে একটি সংগঠনও তৈরি করে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছেন। আসন্ন শারদীয়া উৎসবের সময় পরিবেশ নিয়ে প্রচারে নামবেন সংগঠনের সমস্যরা।

হুগলীর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতি সচেতন বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়ন থেকে গণ নাট্য থেকে লিটল ম্যাগাজিন - নতুন ব্যালার নয়। শারদীয়া উৎসবকে পবচারের জন্য ব্যবহার করাও নতুন নয়। শুধু প্রচারের বিষয়টি একেবারে নতুন - পরিবেশ। তিন দশক আগে ১৯৭২- এ স্টকহোমে যে পর্বের শু গত এক দশকে ত ার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে এদেশে, এমনকি হুগলীর গঙ্গার ঘাটেও। ১৯৭২ - এর আন্তর্জাতিক স্টকহোম সম্মেলন কিন্তু একগুচ্ছ ঘোষণাপত্র ছাড়া তেমন কিছু হয় নি। উপস্থিত হয়েছিলেন মাত্র জনা কয়েক রাষ্ট্রপ্রধান। যার অন্যতব ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। গুত্বপূর্ণ আর কেউই ছিলেন না। কেন হঠাৎ পরিবেশকে গুত্ব দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সেই সম্মেলনে গয়েছিলেন তা নিয়ে পরিবেশ ঐতিহাসিকরা গবেষণা করতে পারেন। কারণ ভারতে তখন পরিবেশ মফতরই ছিল না। ছিল না কে ানো আইন কানুন। ঐ সম্মেলনের তৎকালীন কোনো গুত্ব অন্তত সংবাদ মাধ্যম দেননি, ঐ সময়কার বেশ কিছু ক্যুইজ বুক বা পরীক্ষার প্রান্তর বইতেও কখনও স্টকহোম সম্মেলনের উল্লেখ নেই। আশর দশক থেকে অবস্থা পাল্টাতে থাকল দ্রুত। ফলে ১৯৯২ - এ যখন স্টকহোম সম্মেলনের কুড়ি বছর পূর্তিতে (অবশ্য স্টকহে াম সম্মেলনের কোনো দশ বছর পূর্তির সম্মেলন নেই!) রিও ডে জেনিরোতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল, তাতে যোগ দিলেন বধ্বের সবচেয়ে বেশ সংখ্যক রাষ্ট্রপ্রধ ান। দেড় শতাধিক রাষ্ট্রপ্রধান যে বষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে আসেন তার গুত্ব যে প্রাতীত তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। এরকম গুরনত্বপূর্ণ বিষয় যে র াজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক মতামতকেও প্রভাবিত করবে তাও স্বাভাবিক। ফলে গত দু দশকে পরিবেশ রাজনীতি ও ব্যবসার সাথে জড়য়ে গেছে। পরিবেশ হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার, ব্যবসার নতুন ক্ষেত্র - ফলে এতে জড়িয়ে পড়েছে সরকার, রাজনৈতিক দল। ব্যবসায়ী এবং এনজিওরা। গত এক দশকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের পলে যে আরেক ঝিায়ন ঘটে চলেছে তার হাওয়া থেকে হুগলী বাদ যায় কী করে?

হুগলীর এই সমাজসচেতন মানুষেরা পুজোর আগে পরিবেশ নিয়ে যে প্রচারে নামবেন - তার মূল লক্ষ্য প্লাসিটিকের ব্যবহার বন্ধ করা। প্লাস্টিক ব্যাগ নয় (ওটাতো সরকারই করছে), প্লাস্টিকের জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার বন্ধ করা থাকবে একটি প্রধান স্লোগান। বন্ধ করতে হবে প্লাস্টিকের খেলনাও। এই দূষণ নাকি ভয়ানক সমস্যায় ফেলেছে হুগলীর অধিবাসীদের। এখানের জলদূষণের প্রধান সমস্যা কি প্লস্টিক (পিভিসি বা পলিইথিলিন)। জলাধারের জন্য? আর প্লাস্টিক জলাধার বা পাইপ থেকে কতটা দূষণ হয়? তার পরিণাম কি? না, সংগঠকেরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না। এই অঞ্চলের পানীয় জল দূয়ণের প্রধান উৎস কী? এসবও তারা খুব একটা ভাবেন নি। একটি বিদেশী পরিবেশবাদী গ্রুপের প্রচারপত্র থেকে প্লাস্টিক জলাধার থেকে কী কী দূষণ হতে পারে তাই তাদের তথ্যভিত্তি। কিন্তু এইসব দূষণ ঠিক কী কী ভাবে ঘটতে পারে তা তারা জানেন না এবং এজন্য পাড়ার কোনো রসায়নের শিক্ষককেও তারা জিজ্ঞেস করেন নি। যে সব দূষণের কথা বলা হচ্ছে তা কি এখানকার পরীক্ষাগারে মাপা যাবে? তাও তারা জানেন না। জানেন না ভারতীয় মাত্রা অনুযায়ী পানীয় জলে দূষণের মুখ্য মূষকগুলি কী?

হ্যাঁ, পরিবেশ আন্দোলন করতে গেলে এসব না জানলেও চলে। বেশ কিছু প্রকৃতি প্রেমের কথা বা বেশ গরম গরম সমাজব্যবস্থা নিয়ে পুঁজিবাদীদের মুন্ডপাত - এসব নিয়েই করে ফেলা যায় চকচকে পরিবেশ আন্দোলন। ঝকঝকে কাগজে ফুটফুটে ছবি নিয়ে ইংরাজী প্রচারপত্র।

এসব প্রচারপত্রে পাবেন ওজোন গহ্বর থেকে ডায়অক্সিজেন হাজারো কথা - কিন্তু পানীয় জলের মুখ্য সমস্যা প্রাণঘাতী জীবাণুর কথা থাকে না। কারণ পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সমস্যা অনেকদিন নেই। হুগলীর এই আদর্শনিষ্ঠ মানুষরাও বেশ গরম প্রতিষ্ঠানবিরোধী পরিবেশবাদে মজে নিজেদের পানীয় জলের সমস্যা ভুলে গেলেন। পানীয় জল নিয়ে যদি কোনো প্রচার করতেই হয় তবে তাদের প্রথম কাজ পানীয় জলে কোনোভাবে মানুষের মলমূত্রজনিত নোংরা প্রবেশ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা। এর থেকে জলে প্রবেশ করবে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু - পেট খারাপ থেকে কলেরা বা জন্ডিস, সবই ঘটাতে পারে যারা। এর ফলাফলও প্রায় হাতেনাতে - জীবনমৃত্যুর টানাটানি। প্লাস্টিক জলাধারের দূষণের ক্ষতি হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারে, বেশ দশ-কুড়ি বছর পরে। কিন্তু যাদের এক গ্লাস জল পান জীবন বা মৃত্যুর জুয়া খেলার মতন, তাদের 'দীর্ঘস্থায়ী' 'সম্ভাব্য' 'কিছু' ক্ষতির কথা ভাবলে চলে কী করে। এটা অনেকটা পুপুলেয়ার খরা কবলিত গ্রামে কোন ব্রান্ডের মিনারেল ওয়াটার বেশ বিশুদ্ধ তার আলোচনা করার মতন।

সত্যি কি আমাদের পানীয় জলে এসব জীবাণুরা থাকে? হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির শ্রী সুভাষ দত্ত এ ব্যাপারে একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা করেছেন। সুভাষবাবুর সংগঠন সে অর্থে ঝকঝকে পরিবেশ সংগঠন নয়, দেশী-বিদেশী অনুদানও গ্রহণ করে না। তিনি গত বছর বিভিন্ন স্থানের পানীয় জলের পরীক্ষা করান বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী পরীক্ষাগারে। এতে উত্তরপাড়ার প্রতিবেশী বালী পুরসভার জলেরও নমুনা ছিল। ওনার পরীক্ষাপ্রাপ্ত ফলাফলের কয়েকটি নীচে দেওয়া হল

বি.দ্র. পানীয় জলে মোট কলিফর্ম ১০-এর নীচে থাকতে হবে। এর একক হল MPN/100ml। ফেকান কলিকর্ম, একটিও থাকতে পারবে না।

দেখাই যাচ্ছে যে আমাদের পানীয় জলে কী ভয়ানক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুরা থাকে। এ দেশে পানীয় জল নিয়ে কিছু করতে হলে প্রথম কাজ জীবাণুরা থাকে। আমাদের পুরসভাগুলির পাইপে থাকে বিভিন্ন ছিদ্র, গাহর্স্থ্য বর্জ্যে জলের পাইপ আর পানীয় জলের পাইপ থাকে পাশাপাশি। ঠিকমত ক্লোরিন ব্যবহার করে নির্বীজ করা হয় না - এসব নানা কারণে নিরাপদ পানীয় জল পাওয়াটাই দুরূহ। যাদের এসব সমস্যা নেই তারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দূষণ নিয়ে মাথা ঘামাতেই পারেন। নিউইয়র্ক শহরে ১০০০ স্থান থেকে জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয় আর পানীয় জলের পরীক্ষায় আছে ২০০ টি দূষকের নাম। আমরা কি এখন ঐ মানের জন্য প্রচারে নামব? সুভাষ দত্ত তা করেন নি। দুটি মুখ্য দূষককে পরিমাপ করিয়ে কাকাতা উচ্চ আদালতে মামলা করেছেন পুরসভাগুলির বিদ্ধে। সম্প্রতি এই মামলার অন্তর্বর্তী রায়ে পুরসভাগুলিকে নোটিশ দিয়েছে উচ্চ আদালত।

হুগলীর ঘটনা দিয়ে এজন্য শু করা হল, কারণ হুগলীর এই সংগঠনের লোকেরা প্রথমেথ জানিয়ে দিয়েছিন যে তাদের এইসব কর্মকান্ডে তারা কোনো দেশী-বিদেশী অর্থ নেন না, এবং বিদেশী অর্থপুষ্ট সংগঠনকে তারা এই উদ্যোগে ডাকবেনও না। পরিবেশ নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু পবিবেশের সমস্যা কোনটা তা জানিয়ে দেবার জ্য অর্থপুষ্ঠ লোক আছে অনেক দেশী ও বিদেশী।

যেখানে দেখিবে ছাই

সে কথা তো জানা আছে আবার - "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন"। সেই ছাইয়ের কথায় আসা যাক। হঠাৎ যদি দেখেন কোনো নতুন পরিবেশ সংগঠন প্লাস্টিকের বিদ্ধে, বিশেষত পিভিসির বিদ্ধে তেড়ে-ফুঁড়ে নামছে, কারণটা জানতে হলেবিখ্যাত অন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠনের ভারতীয় শাখার ওয়েবসাইটটা দেখে নিন। নিশ্চয়ই ওরা ভারতীয় কর্মকান্ডের যে আদেশ রেখেছেন তাতে পিভিসি রয়েছে। সুতরাং বুদ্ধিমান সংগঠন, যাদের বিদেশী অর্থ ও যোগাযোগ দরকার, তাদের পিভিসির বিদ্ধে লড়াইয়ে একনই নামতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী নামী সংগঠনগুলির অবস্থাও এখন বহুজাতিক কর্পোরেশনের মতনই। এদের কর্মীরা স্রেফ যে-কোনো অফিসের কর্মীর মতনই, বিশেষত এদেশে তাদের দু একজন শ্বেতকায় প্রতিনিধের মান এতই খারাপ যে সংগঠনগুলির ওপর ভরসা করা কতটা যাট তা ভেবে দেখা দরকার।

ছাইয়ের কথায় আসা যাক। ঐ আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভারতীয় কর্মকান্ডের আরেকটি নির্দেশ বর্জ্য চুল্লীর (Incinerator) বিদ্ধে অভিযান। হাসপাতালের বিভিন্ন সংক্রামিত বর্জ্যকে নষ্ট করবার জন্য বিশেষ চুল্লীতে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। সুতরাং এই অভিযানে নামবার জন্য তৈরি হয়ে গেল মুম্বাই মেডওয়েস্ট অ্যাকশন গ্রুপ (MMAG)। মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে দূষণের বিদ্ধে সচেতনতার অভিযান. আর বিশেষ প্লাস্টিক বা চুল্লীর বিদ্ধে অভিযান কিন্তু সম্পূর্ণ অভিন্ন। যেমন ধরা যাক পাড়ায় ম্যালেরিয়া হচ্ছে। সে জন্য মর্দমা পরিষ্কার রাখা, মশারী খাটানো, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করাটা উদ্যোগী মানুষেরা মিলে করে থাকেন। কিন্তু রোগ নিবারণে কোনো ওষধ খাওয়া হবে, খেলে তার কী পরিতিক্রিয়া, কোন মশাটা বেশি দায়ী - এসব করতে হলে ডাকতে হবে চিকিৎসককে বা মশা বিশেষজ্ঞদের। আপনার ছেলের জ্বর কমাতে যদি ডাক্তারবাবু না এসে প্রচারপত্র হাতে ক্লাবের দাদা এসে দাঁড়ায়, তাবলে কেমন হবে?

পরিবেশের ক্ষেত্রে এসবের কোনো বালাই নেই। মেডিক্যাল ওয়েস্ট অর্থাৎ চিকিৎসার বর্জ্য নিয়ে অ্যাক্সন গ্রুপ তৈরি হয়ে গেলেও তাতে অভিজ্ঞ ডাক্তার বা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে তার কোনো দরকার নেই। চিকিৎসার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক আছে। কিন্তু MMAG জানে যে বর্জ্য চুল্লীর বিদ্ধে অভিযান চালানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তারা মুম্বাই শহরের হাসপাতালের চুল্লিগুলির একটি সমীক্ষা পর্যন্ত করে ফেলেন। কারা করল এই সমীক্ষা? সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররা। না, পরিবেশ নিয়ে কাজকর্মে কোনো বিশেষ জ্ঞানের দরকার নেই, ফলে ছাত্রদল বেরিয়ে পড়লো সমীক্ষায়। কেন যে হাসপাতালগুলি সেই সমীক্ষায় রাজী হন তা জানা যায় না। তবে যেহেতু এইসব NGO দের উচ্চমহলে যোগাযোগ খুব ভাল ফলে এদেশে এসবে অসুবিধে হয় না। কোনো প্রাইভেট কোম্পানি এ ধরণের অশিক্ষিত কর্মীদের দিয়ে সমীক্ষা করালে সে রিপোর্ট টেবিলে স্থান পেত না। কিন্তু সন্ত্রান্ত ঝকঝকে NGO দের কথা আলাদা। আর ছাত্ররা আবার "সেন্ট-জেভিয়ার্স" কলেজের যে, দাদারের অনামী কলেজ নয়।

যেহেতু চিকিৎসার বর্জ্য আইন পাস হয়েছে ১৯৯৮-এ, ফলে ১৯৯৯ -এ সব হাসপাতালের চুল্লিগুলি একেবারে কাম্য মানের হবে তা অব

াস্তব। কিন্তু এগুলি এখন যে কাজ করে চলেছে তা কি দূষণ ঘটাচ্ছে? তাহলে মাপতে হবে চুল্লীর ধোঁয়া। এসব মাপবার কথা সম্ভবত এদের জানাই নেই। ধরা যাক সব চুল্লী ঠিক নেই, ফলে ভারতীয় মান অনুযায়ী নতুন চুল্লী কিনে লাগালেই হয়। কিন্তু তাহলে তো চুল্লীবিরোধী অভিযান সম্পন্ন হলো না। সুতরাং তারা চুল্লীর ছাই সংগ্রহ করে (যদিও যে কোনো নমুনা সংগ্রহেও প্রশিক্ষণ দরকার) ত া মাপালেন এবং ঘোষণা করলেন যে চুল্লীর ছাই বিষাক্ত! ফলে আর চুল্লী রাখাই চলবে না। কেন বিষাক্ত? কারণ পানীয় জলে সীসা থ াকার সীমা হচ্ছে ০.১-১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। সেখানে হয়ে আছে ৬.৮ বিলিগ্রাম প্রতি লিটার! দস্তা (Zinc), ক্যাডামিয়ানও প্রতি মিলিলিটারে আছে অনেক। পাঠক যখন বাজারে চাল বা আটা কেনেন তখন কি কেজিতে কেনেন না লিটারে কেনেন? আর যখন তেল কেনেন তখনতো লিটারেই কেনেন। অর্থাৎ খুব সাধারণ জ্ঞান থাকলেই জানা যায় যে ছাই বা কোন শক্ত পদার্থে লিটারে মাপা যায় না। লিটার মাপা হয় তরল কিংবা গ্যাসের। কিন্তু MMAG -র রিপোর্ট ছাই মাপছে লিটারে।

মনে রাখবেন এটা কোন ছাপা ভুল নয়, কারণ ছাইয়ের গুণাগুণের সঙ্গে পানীয় জলের মান তুলনা করাটা আরও বড় ভুল।

এছাড়া আরো বড়, দন্ডনীয় ভুল হচ্ছে যে MMAG -বই লিখেছে যে ভারতীয় পানীয় জলের মান (IS-2490) এবং (IS-3306) -এর সঙ্গে তারা তুলনা করছেন। আসলে (IS-2490) এবং (IS-3306) -এর সঙ্গে পানীয় জলের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি হচ্ছে শিল্প থেকে বর্জ্য জলের মান সংক্রান্ত তালিকা। পানীয় জলের মানের জন্য রয়েছে (IS-10500)।

তাহলে ভাবুন, যারা ছাই এবং জলের মাপ কী হয় জানেন না, পানীয় জলের আর শিল্পের বর্জ্য তাদের মান কী জানেন না, তারা যখন বর্জ্য থেকে কীভাবে ওসব দ্রবণ নয় তার আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে নেবে যান তার কারণ কী হতে পারে? বিদেশী অর্থ, যোগাযোগ, বিদেশ ভ্রমণ - স্রেফ এইজন্য এইসব মেবে গেছে পরিবেশের উন্নয়নে। এই ধরনের সংগঠনের শাখা এখন সারা দেশে, এই কলকাত াতেও গজিয়ে উঠেছে।

নন্দলালেরা এখন

বিপদটা আরো বেশি এজন্য যে সংবাদ মাধ্যমও পরিবেশের বিভীষিকা প্রচার করতে ভালবাসে, তাতে সাংবাদিকের পরিবেশবান্ধব ভ াবমূর্তিটাও ভাল হয়। এই সব ক্রমশ প্রচারে হুগলীর সংগঠকদের মতনই অনেকেই প্রভাবিত হন। আরো দুটি ঘটনা বললে অবস্থাটা বোঝা যাবে। কিছুদিন অ াগে একটি সভায় পরিবেশ নিয়ে আলোচনার বিষয় ছিল - POP নিয়ে। POP মানে Persistent Orvanic Pollutant - অর্থাৎ যেসব জৈবরাসায়নিক দূষক দীর্ঘকাল পরিবেশে স্থায়ী হতে পারে। ১২ টি দূষককে এরমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদের ডাকনাম ডার্টি ডজন। এর বধ্যে অন্যতব রাসায়নিক হচ্ছে ডিডিটি (ডাই ক্লোরোডাই ফিনাইলট্রাইক্লোরোইথেন)। ডিডিটি এখনও এদেশে পরিচিত নাম। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কার্যক্রম (United nations Environment Programent Programme) এই সব POP কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্যোগী হলে, বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রুপ এবং গরীব দেশ ডিডিটিই এ তালিকা থেকে বাইরে রাখতে বলেছে। কারণ গরীব দেগে ম্যালেরিয়া পুখতে ডিডিটিই এখনও সবচেয়ে সস্তা ও কার্যকরী হাতিয়ার। আর ম্যালেরিয়া এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হত্যাকারী রোগ, বছরে ২০ লক্ষ লোক মারা যায় ম্যালেরিয়ায়। এর বড় অংশই আবার শিশু। ম্যালেরিয়া নিবারণে চীন ও ভারত এখনও প্রচুর ডিডিটি ব্যবহার করে। এসব নিয়ে আলোচনা হয় ঐসভায়। কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন স্থানের সভায় উপস্থিত ছিলেন এক তণী, বেশ অনুশোচনার সঙ্গে জানালেন যে ডিডিটির যে বিভিন্ন ব্যবহার আছে, ম্যালেপিয়া নিবারণে এর এতবড় ভূমিকা (বিলেতে অ ামেরিকাতেও যে লোকে ম্যালেরিয়ায় হামেশাই মরত, একথা এখন প্রায় অজনা) ইত্যাদি এসব উনি আগে জানতেন না এবং এর নিষিদ্ধকরণ নিয়েও যে এই বিতর্ক আছে তার তা অজানা। মহিলা একটি এন জিও তে তাদের প্রকাশনায় কাব্য করেন এরং তারা ডিডিটি নিয়ে বই ছাপান। কিন্তু ডিডিটির এসব দিক উনি কোনোদিন শোনেন নি।

প্রচার মাহাত্ম্যের আরেক বড় এবং প্রভাববিস্তারকারী আরেকটি ঘটনা শোনা যাক। আকাশবাণীর এফ এম চ্যানেলে রাতে এক একটি বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। সেদিন অনুষ্ঠান পলিচালনাকারীরা বিষয় ঠিক করেছেন - ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দূষিত ইস্পাত এদেশে অ ামদানী সম্পর্কে মতামত। দু-একটি ইংরাজ সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি সংবাদের ওপর ভিত্তি করে করে তারা বিষয় ঠিক করে ফেলেছেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের কাছে ফোনে মতাবম চাওয়া হয়। এই দূষণ সম্পর্কে মতামতের জন্য ফোনে কথা বলা হয়েছিল এই লেখক এবং কলকাতা ঋিবিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ড রবীন মজুমদারের সঙ্গে। রবীনবাবু শ্রদ্ধেয় মানুষ। একজন বেশ কিছুটা কঠোর পরিবেশবাদীও বটে। তিনিও ফোনে জানালেন যে বিদেশ থেকে দূষিত বর্জ্য উন্নয়নশীল দেশে রফতানীর ব্যাপারটা ঘট, কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের (১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, ইসলামী মৌলবাদী আক্রমণে ধবংসেপ্রাপ্ত) ইস্পাত দূষিত কেন হবে তা তিনি ঠিক একনই বুঝতে পারছেন না। সাধারণভাবে আগুনে ভস্মীভূত হলে সেই ভবনের ইস্পাত দূষিত হয় বলে উনি জানেন না। বিশেষ কোনো অভিযোগ থাকলে তার জন্য অনুসন্ধান দরকার।

এই লেখকও ফোনে বললেন যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চাপপাশে বায়ু ও জলের মান নিয়ে প্রচুর তথ্য আমেরিকার পরিবেশ সংস্থা জানিয়েছেন। তাতে গুতর দূষণের কোনো আশঙ্কা নেই। অতএব ইস্পাত থেকে দূষণ হবে তা বলে দেওয়াটা ঠিক নয়।

ফোনে বক্তব্য রেখেছিলেন জনা দুয়েক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। তারা কিন্তু বিশদে জানিয়ে গেলেন যে এজন্য কি ভয়ানক দূষণ হতে যাচ্ছে!

আসলে সমস্যাটা এখানেই যে অনুষ্ঠানকারীরা ধরেই নিয়েছেন যে দূষণ এতে হবেই, কিন্তু আদৌ এই খবরটার কোনো গুত্ব আছে কিনা তার জন্য কারো মতামত নেওয়া জরী মনে করেন নি। ফলে অনুষ্ঠানে তারাই যাদের বিশেষজ্ঞ বলে নিশ্চিতকরেছিলেন তারা বিষয়টিকে গুত্বই দিলেন না, অথচ যারা এ বিষয়ে সামান্যই জ ানেন তারা এটিকে নিয়ে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিলেন আকাশবাণীর গুত্বপূর্ণ চ্যানেলে। ভাবুন তো, এটা যদি কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় হতো তাহলে ব্যাপারটি কেমন দাঁড়াত?

অনুষ্ঠান চালকেরা ঠিক করে নিছেন অমুক রোগটা কী ভয়ানক। চিকিৎসকরা বলছেন - ওটা তেমন কিছু নয়, আর অন্যরা বলে যাচ্ছেন শেষের সেদিন কি ভয়ংকর। শ্রোতারা কি বুঝছেন কে জানে!

পরিবেশ নিয়ে যা খুশী বলবার আরো বড় অধিকারের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে আদালত। অবশ্য আদালতকে এই ভূমিকায় আসতে বাধ্য করেছে আমাদের দেশের সরকারী আমলা, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীরা। যাদের দূষণ সংক্রান্ত বিষয় দেখবার কথা তারা সময় মতন তাদের কাদ করেন নি বলেই আদালতে মাবলা হয়েছে। যেমন বিখ্যাত গঙ্গাদূষণ সংক্রান্ত মামলা। কিন্তু এই সব মামলার অনেক রায়েরই কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তি নেই। কিন্তু সরকারী দফতরগুলি তরা কোনে

া বিরোধিতা করেনি। যেমন, গঙ্গা দূষণ সংক্রান্তমামলায় গঙ্গা উপত্যকার শিল্পগুলির বায়ুদূষণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অথচ যার সঙ্গে গঙ্গা দূষণের কোনো স ম্পর্ক নেই। একইবাবে তুঘলকী রায়ে দিল্লীর ক্ষুদ্রশিল্পকে দিল্লা শহরে সি.এন.জি.তে সমস্ত গাড়ি চালানোর রায়ও সেরকমই। এতে একমাত্র লাভবান হয়েছে দিল্লীর ধনী ও উচ্চবিত্ত মানুয়েরা। সুপ্রীমকোর্ট প্রায় হয়ে উঠেছে দিল্লী হাইকোর্ট। এমনকি দেশে স্নাতকস্তরে প্রবেশকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পঠন শু হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে।

এই অত্যুৎসাহে কখনো কৌতুকপ্রদ পরিবেশ সচেতনতা তৈরী হচ্ছে। যেমন কাকাতা হাইকোর্টের শব্দ দূষণের সীমা ৬৫ ডেসিবেল। একজন বিচারপতি ও একজন আইনজীবী এ রাজ্যে শব্দ দূষণ বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন। অথচ যা বলা হচ্ছে তা সরই ভুল। ভারতীয় আইনের কোথাও বলা নেই, ৬৫ ডেসিবেল শব্দ সীমার কতা, শব্দবিজ্ঞান নিয়ে যাদের সামান্য চর্চা আছে তারাও জানেন যে ৬৫ ডেসিবেল আদৌ কোনো উচ্চনাদ নয়। শব্দ দূষণের একটি সীমা আছে যাতে বলা বাণিজ্যিক অঞ্চলে ১৫ ঘন্টার শব্দমানের লগ সমতুল হতে হবে ৬৫ ডেসিবেল। এটি জানতে গেলে বিভিন্ন সময়ের শব্দের মান নিয়ে একটি অংক করতে হয়। কিন্তু এতসব পরিবেশের জন্য করার কোনো মানে হয় না। ফলে আইনজীবী শব্দমাপক খন্ড নিয়ে ঘুরছেন। কোনো অচিকিৎসক এরকম গলায় স্টেথো নিয়ে ঘুরলে তাকে আমরা ঠর্গ বলে থাকি। একইভাবে শব্দদূষণের জন্য বন্ধ করা হচ্ছে সমস্ত শব্দবাজী যদিও তার জন্যও ভারতীয় আইন আছে। অবশ্য এসব হম্বিতম্বি সব বন্ধ হয়ে যায় আজ ানের মাইকের সামনে। মাইকে আজানের অধিকার নিয়ে ইমামদের মামলা কলকাতা হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে খারিজ হয়ে গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পুজোর জন্য বিখ্যাত চন্দনজরের সংগঠকদের হাজতবাস করতে হয়েছে।

আর শব্দ দূষণের এই প্রহসনে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন অনেক সাধারণ সঙ্গীত শিল্পী ও বাজিয়েরা পাড়ার তবলচীর শুকনো মুখ দেখে বুঝেছি শব্দভেদী ব াণ কী নিদাণ!

ছায়াময় পথে

পরিবেশ সমস্যার মতন একটি ব্যাপক সমস্যার মোকাবিলা করতে দয়ে সবসময় সবকিথু জেনে বুঝে কাজ করা সম্ভবও হয় না। নিজস্ব, বিাস, বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কখনো উদ্যোগ নিতে হয়। যেমন নিয়েছেন হুগলীর মানুষ বা আকাশবাণীর অনুষ্ঠান চালক। যেমন একটি ছোট দ্বিমাসিক পত্রিকা খুবই পারমাণবিক শক্তি বিরোধী। তারা এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই প্তকা যিনি চালান, সম্পাদক মশাই কিন্তু পারমাণবিক বিকীরণ সম্পর্কে খুব একটা অবহিত নন। তাঁদেরই আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি প্রথম জানলেন যে তিনি এই বিকীরণ সমুদ্রেই ডুবে আছেন, এবং প্রথমে তা মানতেই নারাজ ছিলেন। কিন্তু এঁরা সবাই একটা বিষয়ে এক - যে তারা এ কাজ কোনো অর্থ, খ্যাতি

বা অন্যান্য লাভের জন্য করেছেন না। পত্রিকার সম্পাদক প্রায় পকেটের পয়সা দিয়েই অন্যের লেখা পারমাণবিক শক্তি বিরোধী বই ছ াপাচ্ছেন, হুগলীর মানুষ জনস্বার্থেই প্লাস্টিক জলাধারের বিদ্ধে উদ্যোগ নিয়েছেন। এমনকি অনেক আইনজীবীরাও পরিবেশের স্বার্থে মহৎ কিছু করেছন বলে ভাবছেন।

কিন্তু এর পাশাপাশি রয়েছে আর একটি বিশাল জগৎ। এরা দেশী-বিদেশী পরিবেশ এন জিও। দিল্লী-মুম্বাইয়ে এদের রমরমা দেখবার মতন। কলকাতায় সবে এরা উঠছেন। এরা পরিবেশকে বিভিন্ন কারণে বেছে নিলেও এটি এখন তাদের অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উৎস। যেমন বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী সংগঠন পরিবেশ বিষয়ক ব্যবসা শু করেছে। এই ব্যবসায় কেউ বানাচ্ছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, কেউ দূষণ মাপছে। কেউ উপদেশ দেয়। এ সবই করা হয় ব্যবসা বাণিজ্যের একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে। পেশাদারী সমাদসেবী এন জিওরাও ঠিকই একইভাবে নতুন সেবার কর্মক্ষেত্র হিসেবে তেছে নিয়েচে পরিবেশ। কারণ পরিবেশ খাতেই এখন অনেক অর্থগম। এবং শুধু পবিবেশ নয়, পবিবেশের বিশেষ বিশেষ কিছু সমস্যা নিয়ে খাতা সারলেই অর্থাগম। যেমন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে হলে করতে হবে এইডস নিয়ে, ম্যালেরিয়া নয়। কারএ ওতে পয়সা নেই। এইসব এনজিওদের পরিবেশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কোনো প্রয়োজন হয় না। বিদেশী প্রচারপত্র এবং চকচকে ইংরেজি ঝকঝকে প্রকাশনা এবং উন্মত প্রচারের মাধ্যমে এরা অচিরেই পরিবেশ বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। প্রতিষ্ঠান বিরোধী সংলাপ, জনস্বার্থের ফুলঝুরি, দূষণের কেরামতের ছবি - সব বিলিয়ে ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে যায়। ঠিক গ্রাম াঞ্চলে কোয়াক ডাক্তারেরা যেভাবে গুছিয়ে ব্যবসা করেন। সেভাতেই কিন্তু উজ্জ্বল ভাবমূর্তি নিয়ে প্লেনে দিশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে এরা মাস ট্রান্সপোর্ট নিয়ে ভাষণ দেন। সমস্ত চকচকে ইংরাজি পত্রিকা থেকে যত সুন্দরী প্রতিযোগিতার সুন্দরীরা সরাই এখন পরিবেশ বলতে অজ্ঞান। শিক্ষিত ডাক্তারের অভাবে, গ্রামাঞ্চলে শেষ পর্যন্ত মানুষকে এই কোয়াকদের উপরই নির্ভর করতে হয়, যতই তাদের গ ালমন্দ করা হোক না কেন। গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বালমন্দ মিলিয়ে তারাই দাঁড় করিয়ে রখেছে। পরিবেশের জগতেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন, সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ - এরা সাধারণত নীরব হয়েই থাকেন। ফলে পবিবেশ দূষণের বিদ্ধে আওয়াজ তুলছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিই। কিন্তু এখনও খুব সচেতনভাবেই এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে কিছু সংগঠনও।

পরিবেশ নিয়ে এই আতিশয্যে যাদের দূরাবস্থার কথা হারিয়ে যাচ্ছে, তারা হচ্ছেন শ্রমিকরা বা গরীব মানুষেরা। দিল্লী শহহ থেকে সব শিল্প সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হল। এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কয়েক লক্ষ শ্রমিক যারা কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না। হাওড়ার কারখানায় চিমনী থেকে দূষণ এখন অনেক কবে এসেছে কিন্তু কারখানার ভিতরে শ্রমিকরা অবর্ণনীয় পরিবেশে কাজ করে যাচ্ছেন। পরিবেশ আইন কার্যকরী হচ্ছে কিন্তু ফ্যাক্টরিতে অ্যাক্ট কার্যকরী হচ্ছে না। নিউইয়র্ক থেকে দূষিত ইস্পাত এল কনা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। কিন্তু সেই নিউইয়র্ক শহরে হাওড়া থেকে যা ঢালাই লোহার সামগ্রী যাচ্ছে সে কারখানার শ্রমিকের পরিবেশের কথা ভাববার কেউ নেই। গরীব মানুষের ঘরে এখনো আলো জ্বলল না তাকে বোঝানো হচ্ছে বিকল্প শক্তির কথা।

অন্য সুন্দরবন

এই শেষ করা যাক সুন্দরবন দিয়ে। হুগলীর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক সুন্দরবনের মানুষ - এদের বাদ দিয়ে কি পরিবেশ ভাবনা এগুবে? সুন্দরবনের মানুষজন বন জঙ্গল পরিবেশ নিয়ে কি ভাবছেন দেখা যাক।

সুন্দরবনের একটি বড় দ্বীপ কুয়েমুড়ি দ্বীপ। রাতে রায়দীঘি থেকে সকালে ২ ঘন্টা লঞ্চে চেপে সুন্দরবনের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে কুয়েমুড়ি দ্বীপে পৌঁছান যায়। পূর্বদিকে চওড়া নদী পেলে একেবারে জঙ্গলে কুয়েমুড়ি বড় দ্বীপ। দ্বীপে কোনো পাকা রাস্তা নেই, নেই বিদ্যুৎ। 'আরোগ্য সন্ধান' নামক একটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ২৪ মার্চ, ২০০২ একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করে। প্রায় সাড়ে ছশো মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয়। 'বসুন্ধরা' সংগঠন এই রে াগীদের কিছু মানুষের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত একটা সমীক্ষা চালায়। এ ছাড়া সমস্ত রোগীদেরই আর্থ-সামাজিক একটি সমীক্ষা করা হয়। কুয়োমারী দ্বীপে কেউই পায়খানা ব্যবহার করেন না। সবার প্রধান সমস্যা খাবার জলের। নলকূপ অনেক দূরে দূরে। মাঝে মাঝে তা খারাপ হয়ে থাকে। রাকা রাস্তাও কম। সুন্দরবনের এই

মানুষেরা দূষণ নিয়ে কি ভাবেন?

প্রশ্ন ছিল কোন দূষণ নিয়ে তারা চিন্তিত? ৬৫ শতাংশ মানুষই চিন্তিত পুকুরের জলের দূষণ নিয়ে। পায়খানা না থাকায় যে-কোনো জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ পুকুরের জলে দূষণ ঘটাচ্ছে। এ ছাড়া যে যেমন নোংরা ফেলে, পাড় ভেঙে আছে, গ-মোষ ধোয়াচ্ছে। কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। সুন্দরবনের গ্রামের পুকুর কি করে ভাল রাখা যায় তা হতে হবে পরিবেশবিদের গবেষণার বিষয়। অবশ্য ১৭.৫% মানুষ কোনো উত্তর দেননি। অর্থাৎ বাকি ৩৫% মানুষ দূষণ নিয়ে ভাবেন না। জঙ্গলের কাছে হলেও মাত্র ৩২ শতাংশ মানুষ কখনও জঙ্গলে গিয়েছেন। সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে ২৫% মানুষের বাঘ নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। স্থানীয় মানুষ কিন্তু বাইরের মানুষ এখানে ঘুরতে আসুক খুব চান। ৮৭.৫% মানুষ মনে করেন, বাইরের লোক ঘুরতে এলে তাদের ভালই হবে।

৭ এপ্রিল, ২০০২, একই সমীক্ষা চালানো হয় রায়দীঘিতে স্বাস্থ্যক্যাম্পে। রায়দীঘিতে হয়েছিল বিশেষ এন্ড্রোস্কোপি ক্যাম্প। এখানের রোগীরা সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিলেন। এখানকার সমীক্ষায় ফলাফল প্রায় কুয়োমুড়ির মতনই। এখানেও মানুষজন বলেছেন যে পুকুরের জলে দূষণই মূল সমস্যা (৫৭%)। আর দূষণ নেই বা জানেন না বলেছেন ৪০% মানুষ চান জঙ্গলে বাঘ বাড়ুক। বাকীরা বাঘ নিয়ে তেমন ভাতেন না। পর্যটকরা ঘুপতে আসুক, তা চান প্রায় সবাই (৮৯%)।

সুন্দরবন সমীক্ষা		
কুয়েমুড়ি দ্বীপ	৪০ æò	২৪÷±äÇ, 2002
রায়দীঘি	৩৫ জন	৭ এপ্রিল, ২০০২
মোট	৭৫ জন	

	কুয়েমুড়ি	রায়দীঘি	মোট
পুকুরের সমস্যাকে প্রধান দূষণ মনে করেন	৬৫%	৫৭%	৬১.৩%
কোনো দূষণ নেই	১৭.৫%	২৩%	২০%
দূষণ নিয়ে মতামত নেই	১৭.৫%	২০%	১৮.৫%
জঙ্গলে গিয়েছেন	৩২.৫%	৪৮.৫%	৪০%
জঙ্গলে বাঘ কমুক	১৭.৫%	২০%	১৮.৭%
জঙ্গলে বাঘ বাড়ুক	৩৫%	৪০%	৩৭.৩%
বাঘ নিয়ে কোন মতামত নেই	৩২.৫%	২৮.৬%	৩০.৭%
Õ±Ëõþ± óûÇéß Õ±üÅß	87.5%	88.6%	88%

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com